তারিখ ... 08 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৯... কলাম ...১......

দৈনিক
ইত্তেফাক

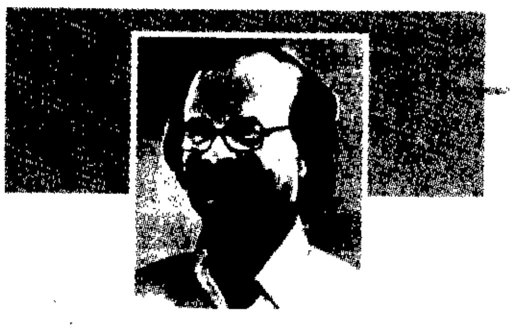

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

বিনিয়োগের সবচেয়ে জরুরি খাত হোক শিক্ষা

নারী শিক্ষা বিস্তারে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামীতে আমরা একটি শিক্ষিত জাতি উপহার পাব এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে। তবে আমি মনে করি, সরকারের একার পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সমাজের বিত্তবানরা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় অনেক আগে থেকেই ভূমিকা রেখেছে

শিক্ষার গুণগত মানের বিতর্ক অব্যাহত রেখেও বলা যায় বর্তমান সরকারের সবচেয়ে সফল যে ক'টি মন্ত্রণালয় আছে তার মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্যতম। শিক্ষা খাতের সাফল্য যদি আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করি তাহলে প্রথমেই বলতে হয় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা। বিগত ৪০ বছরে অনেকবারই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি উত্থাপিত হয় পাকিস্তান আমলে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রতিটি সরকারই নানাভাবে চেষ্টা করেছে একটি সুসমন্বিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের, কিন্তু কোনো সরকারই এ ব্যাপারে সফলতা প্রদর্শন করতে পারেনি। কোনো বারই সবার মতামত নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা যায়নি। এবারই প্রথম সবার মতামতের ভিত্তিতে একটি সুসমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এটি বর্তমান সরকারের একটি বিরাট সাফল্য। যারা বরাবরই এ ধরনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে থেকেছে বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা। মাদ্রাসায় যারা পড়ে তারাও তো আমাদের ভাই-বোন। কাজেই তাদের বাদ দিলে তো শিক্ষানীতির সার্বজনিনতা থাকে না। এ ছাড়া যারা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে তারা তাদের যোগ্যতানুযায়ী চাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় না। মাদ্রাসা শিক্ষাকেও যেন আমাদের মূল ধারার শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে নিয়ে আসা যায় শিক্ষানীতিতে সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে জনসংখ্যা। আগামী ৩০ বছর আমাদের মূল যে সম্পদ থাকবে তা হলো একটি কর্মক্ষম জনশক্তি। ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত দেশ, এমন কি চীন, জাপানেও যখন মানুষ বুড়িয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের দেশে যে কর্মক্ষম জনশক্তি থাকবে তা শুধু আমাদের দেশের জন্যই নয়, সারা পৃথিবীর জন্য এটা একটি বড় সম্পদ হিসেবে থাকবে। এই বিপুল কর্মক্ষম জনশক্তিকে আমরা যদি প্রকৃত জনসম্পদে পরিণত করতে পারি তাহলে তারা দেশের জন্য বিরাট অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু আমরা যদি তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে আমাদের এই সম্পদ কাজে লাগানো যাবে না। এ জন্য প্রয়োজন ছিল যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা।

সরকার সেই কাজটি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। আমরা কিভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেখতে চাই, কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া ইত্যাদি কাজ করার জন্য এ ধরনের একটি শিক্ষানীতি খুবই প্রয়োজন ছিল। সমাজের সবাই যাতে শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বর্তমান শিক্ষানীতিতে সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। এটা হচ্ছে নীতিগত দিক। এই নীতিগত দিক বাস্তবায়ন করতে গেলে বিরাট পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন। বিনিয়োগের প্রশ্নটি এলেই বাজেটের প্রসঙ্গ আসে। ১৮৬৮ সালে মেইজি রেস্টোরেশনের সময়ও জাপানের সাক্ষরতার হার ছিল ইউরোপের চেয়ে বেশি। ১৯০৬-১৯১১ সালে জাপানে মোট বাজেটের ৪৩% বরাদ্দ ছিল শিক্ষায়। বিংশ শতাব্দী জুড়ে, জাপানের যে উত্থান এবং আজও যে জাপান দেখছি তা এরই ফল। সাধারণভাবে বলা হয়, একটি দেশের মোট জিডিপি'র ২০ হতে ২২ শতাংশ শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ হওয়া দরকার। আর বার্ষিক বাজেটের অন্তত ৭ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করবে। বিশ্বের অনেক দেশ, এমনকি আফ্রিকার নাইজেরিয়া বা এ ধরনের দেশগুলো এটা মেনে চলে। এমন কি আমাদের পার্শ্ববর্তী শ্রীলঙ্কা, ভারত এরাও শিক্ষা খাতে উচ্চ বরাদ্দ দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। আমাদের দেশের মোট বাজেটের ২ হতে সোয়া ২ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য বর্তমান সরকার শিক্ষা বিস্তারে নানা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বিশেষ করে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং তারা যাতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও আমাদের নানা স্বল্পতা রয়েছে। আছে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা। অনেক স্থানেই স্কুল ছিল না। কোনো কোনো স্থানে স্কুল থাকলেও হয়তো আসবাবপত্র ছিল না। বর্তমান সরকারের আমলে গত সাত বছরে বিভিন্নভাবে অর্থাৎ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এখন প্রায় সব স্থানেই স্কুল আছে। স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তির হার অনেক বেড়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা ৯৮/৯৯ শতাংশ পর্যন্ত। অবশ্য যারা স্কুলে ভর্তি হয় তাদের সবাইকে আমরা আবার ধরে রাখতে পারি না। কারণ কিছু ছেলে-মেয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই ঝরে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে বই সরবরাহের ব্যাপারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল। কোনো বছরই দেখা যেত নির্দিষ্ট সময়ে বই সরবরাহ করা সম্ভব হতো না। এ বছর প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মোট চার কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম দিনই দেওয়া হয়েছে। এটা বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। সারা বিশ্বের জন্য এটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দল যখন আমাদের দেশে আসেন অথবা আমাদের দেশের প্রতিনিধি দল যখন বিদেশে যায় তখন তারা বিস্ময়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে জানতে চায়। এটা কি করে সম্ভব যে, শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার প্রথম দিনই তেত্রিশ কোটি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে? আমার মনে হয়, বর্তমান সরকারের এই উদ্যোগটি একটি স্মরণীয় ব্যাপার। আমাদের দেশে স্কুলে ছেলে-মেয়ে না আসার একটি প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। অনেক অভিভাবকই মনে করেন যে, তার ছেলে বা মেয়ে স্কুলে না গিয়ে যদি কাজ করে তাহলে কিছু বাড়তি আয় হতে পারে। তাই তারা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। সরকার এ বিষয়টি লক্ষ্য করে শিক্ষা উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। মেয়েদের স্কুলে আনার ক্ষেত্রে উপবৃত্তি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে। লাখ লাখ মেয়ে এখন স্কুলে যাচ্ছে। যারা আগে কখনো স্কুলে যাবার কথা চিন্তাও করতো না আজ তারা নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। বাচ্চাদের দুপুরে স্কুলে খাবার দেওয়া হচ্ছে পরীক্ষামূলকভাবে। এতে দু'টি কাজ হচ্ছে, প্রথমত, বাচ্চারা দুপুরে স্কুল থেকে খেয়ে যাবার ফলে অভিভাবকদের ওপর চাপ হ্রাস হচ্ছে। আমরা জাতীয়ভাবে এখনো পুষ্টিহীনতার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারিনি। সে অবস্থায় একটি বাচ্চা যদি স্কুলে এক বেলা ভালোভাবে খেতে পারে তাহলে সে অনেকটাই পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্তি পেতে পারে। পাকিস্তান আমল থেকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে মাত্র ৪/৫টি বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছিলাম।

বর্তমান সরকার আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০টির মতো। যেসব বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান সরকার আমলে স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো ইতোমধ্যেই সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে। যেমন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যেগুলো ইতোমধ্যেই সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০/৯০টির মতো। কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে ষষ্ঠ বা সপ্তম। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক সাফল্য প্রদর্শন করতে পেরেছি। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেও উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে এত বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ নেই। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন প্রতিযোগিতা করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনোটির মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। নতুন আরো অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। প্রথম দিকে এগুলো কিছুটা সমস্যা মোকাবিলা করলেও পরবর্তীতে তারা ঠিকই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে। সরকারি সাহায্যের আশা না করেই তারা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল বিনিয়োগ করছে। বেসরকারি খাতে উচ্চ শিক্ষার যে ধারণা এটাও বর্তমান সরকার আমলেই ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। কিছু সমস্যা এখনো আছে কিন্তু তারপরও আমরা বলব এই উদ্যোগটি কোনোভাবেই খারাপ নয়। লাইব্রেরি সমস্যা থাকলেও এখন আর সেটি তেমনভাবে অনুভূত হচ্ছে না। কারণ তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সনাতন লাইব্রেরির ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো লাইব্রেরির বইপত্র পাঠ করতে পারছে। আরো একটি বড় ঘটনা ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে যা অনেকেই জানেন না। তাহলো, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক প্রাথমিক পর্যায়ে ৭০০ কোটি টাকা এবং পরবর্তীতে আরো ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এখন গ্রাম পর্যন্ত স্কুলগুলোতে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের কাজ করা হচ্ছে। রাজধানীর ভালো ভালো স্কুলের শিক্ষকদের লেকচার গ্রামাঞ্চলে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে। সারা দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় আমাদের দেশে শিক্ষাটাকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় বলে মনে করা হতো। এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন সবাই ভাবতে শুরু করেছে যে, শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিনিয়োগ। প্রত্যেক অভিভাবক এখন তাদের বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকের নিকট পড়াতে নিয়ে যাচ্ছে অভিভাবকরা; তারা শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। সরকারের শিক্ষানীতি এবং এর পারিপার্শ্বিক প্রভাব পড়েছে বলে আমি মনে করি। আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষা হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ। এ জন্য আমাদের অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আরো একটি বিষয় স্মর্তব্য, শুধু যেনতেনভাবে শিক্ষা বিস্তার করা হলেই জাতি প্রকৃত শিক্ষিত হতে পারবে না। এ জন্য অবশ্যই মানসম্পন্ন শিক্ষার দরকার। সরকার মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে যাচ্ছে।

নারী শিক্ষা বিস্তারে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামীতে আমরা একটি শিক্ষিত জাতি উপহার পাব এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে। তবে আমি মনে করি, সরকারের একার পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সমাজের বিত্তবানরা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় অনেক আগে থেকেই ভূমিকা রেখেছে। দেশে বর্তমানে যেসব প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তার বেশির ভাগই বিত্তবানদের হাতে তৈরি। তারা এ জন্য অর্থ দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন। আমাদের দেশে সরকারি স্কুল বা কলেজের ধারণাটি সম্পূর্ণ নতুন। আগে বিত্তবানরাই স্কুল-কলেজ নির্মাণ করতো। ১৯৭২-৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাইমারি স্কুল সরকারিকরণ করেন। আমাদের সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক ধরনের ঐতিহ্য রয়েছে। এটা এখনো বিলুপ্ত হয়নি। অনেকেই এখনো শিক্ষা খাতে জনসেবায় আগ্রহী রয়েছেন। এদের খুঁজে বের করে কাজে লাগাতে হবে। কিছু মানুষের মধ্যে শিক্ষার তীব্র আগ্রহ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ট্রাস্ট ফান্ডের সংখ্যা সাড়ে তিনশ'র মতো। বিভিন্ন ব্যক্তি আসছেন ট্রাস্ট ফান্ড করার জন্য। অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় অর্থ ব্যয় করে স্কুল-কলেজ করে দিচ্ছে। আমরা যদি এটাকে উৎসাহিত করতে পারি তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব। যারা এ ধরনের উদ্যোগ নিবে আমরা তাদের কিছু সুবিধা প্রদান করতে পারি, তাহলে তারা এ সব মানবিক কাজে উৎসাহ পাবে।

● **লেখক : উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়**